icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৮ ■ সংখ্যা ১ ■ শ্রাবণ ১৪১৬

বাড়ন্ত শিশুর পরিপূরক খাবার

নুসরাত নুয়েরী আলম
ফেলো, আইসিডিডিআর,বি

ছয় মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি যেসব বাড়তি খাবার খাওয়াতে হয় তাকেই পরিপূরক খাবার বলা হয়। 'পরিপূরক' শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটাকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে অন্যটির অভাব পূরণ করা। শিশুর জন্মের পর তার প্রথম ও প্রধান খাদ্য মায়ের দুধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-অনুমোদিত সুপারিশমালা অনুযায়ী ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধই শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে। এরপর পরিপূরক খাবার না-দিলে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; এর সঙ্গে বাধাগ্রস্ত হয় তার মানসিক বৃদ্ধি ও মেধাবিকাশের প্রক্রিয়াও। জন্মের পর প্রথম ছয় মাসে শিশুর ওজন হয় জন্মকালীন ওজনের চেয়ে দ্বিগুণ, এক বছরে তিনগুণ, এবং দুই বছরে চারগুণ। শিশুর এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য বাড়তি পুষ্টিযুক্ত খাবার প্রয়োজন। এছাড়াও, যেসব কারণে পরিপূরক খাবার শিশুর জন্য অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছে:

- ছয় মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পর থেকে শিশুর যে-পরিমাণ দুধের প্রয়োজন সেই পরিমাণ দুধ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া যায় না
- শিশুর জন্মের ৬ মাস পর দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান দুধে থাকে না। দুধে ভিটামিন সি ও লৌহের পরিমাণ এত কম থাকে যে, এতে শিশুর চাহিদা পূরণ হয় না
- খাবার হজম করার মতো প্রয়োজনীয় এনজাইম তখন তৈরি হয়; ফলে, শিশুরা শক্ত খাবার সহজেই হজম করতে পারে
- শিশু চিবিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়া শিখতে শুরু করে

শিশুর ৬ মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পর নিয়মমাফিক পরিপূরক খাবার দেওয়াই শ্রেয়। খুব দেরিতে পরিপূরক খাবার দেওয়া শুরু করলে অনেক সময় শিশুর নতুন খাবার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়।

শিশুদের পরিপূরক খাবার হিসেবে খিচুড়ি ও হালুয়া তৈরির কিছু উপাদান

পরিপূরক খাবার প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু প্রক্রিয়া বা প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা হঠাৎ করে শিশুকে দুধ পানের অভ্যাস পরিবর্তন করে পরিপূরক খাবারে অভ্যস্ত করা যায় না। পরিপূরক খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো মেনে চলা উচিত:

- পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর পাশাপাশি মায়ের দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে
- শিশুকে প্রতিবার কেবল একটি করে নতুন খাবার দেওয়া উচিত
- নতুন খাবারটি পরপর কয়েকদিন দিতে হবে, কারণ এতে শিশু নতুন খাবারটির স্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয় এবং শিশু তা হজম করতে পারছে কি না তা বোঝা যাবে
- শিশুকে প্রথমে অল্প পরিমাণে খাবার দিয়ে তাতে অভ্যস্ত করতে হবে। পরে আস্তে-আস্তে বয়স অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে
- খাবারটি বাটি থেকে চামচে করে খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে
- শিশুকে কখনোই নতুন খাবার খাওয়ার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না
- শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়াতে হবে
- শিশুকে টাটকা ও তাজা খাবার খাওয়াতে হবে

নতুন কোনো পরিপূরক খাবারে যখন শিশুটি অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তখন পছন্দনীয় খাবারের পাশাপাশি অল্প-অল্প করে অন্য নতুন খাবার যোগ করতে হবে। বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের পরিপূরক খাবার তৈরি করা যেতে পারে। শিশুদের উপযোগী সুষম খাবার তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য-উপাদানের মিশ্রণে খাবার তৈরি করা আবশ্যক। কয়েকটি মিশ্র উপাদানবিশিষ্ট খাবারের নমুনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. দ্বিমিশ্র খাবার: শর্করা+প্রোটিন বা ভিটামিন (চাল+ডাল বা ছোট মাছ বা গাঢ় সবুজ শাক-শব্জি)

ভেতরের পাতায়

ধুমপান বিষপানের সামিল: এই বদঅভ্যাস ত্যাগ করার কিছু কৌশল ৩

শিশুর জন্য মায়ের দুধ: সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ৪

সঠিক খাদ্যগ্রহণ শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য ৬

ঢাকার মিরপুরে আইসিডিডিআর,বি-র চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ৮

আইলা-কবলিত এলাকায় আইসিডিডিআর,বি-র বিশেষজ্ঞ দল প্রেরণ ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম এ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সিদ্দিক প্রিন্টার্স, ঢাকা

২. ত্রিমিশ্র খাবার: শর্করা+প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন+ভিটামিন (চাল+ডাল বা ছোট মাছ+শাক-সব্জি)

৩. চৌমিশ্র খাবার: শর্করা+প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন+দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন+ভিটামিন (চাল+ডিম বা ছোট মাছ+ডাল+শাক-সব্জি)

শিশুর খাবার সবসময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি ও পরিবেশন করা উচিত। শিশুকে খাওয়ানোর আগে মায়ের কিংবা শিশুর সেবাযত্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির এবং শিশুর হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। তা নাহলে শিশুর বদহজম, ডায়রিয়া বা পেটে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার, শিশুর বয়স অনুযায়ী খাদ্যের ঘনত্ব ও পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। ছোট শিশুকে বেশি ঘন খাবার খাওয়ালে বা পরিমাণে বেশি খাওয়ানো হলে তা সে বমি করে ফেলে দিতে পারে। তাই অবশ্যই শিশুকে তার বয়সের উপযোগী, পরিমাণমত খাবার প্রদান করতে হয়। নিচে বিভিন্ন বয়সের শিশুর উপযোগী খাদ্যের কিছু নমুনা দেওয়া হলো:

৬-৮ মাস বয়সের শিশুর জন্য: নরম খিচুড়ি, সিদ্ধ ডিমের সাদা অংশ, সিদ্ধ সব্জির ছাঁকা রস

৯-১২ মাস বয়সের শিশুদের জন্য: আলু ভর্তা, দুধে-ভেজানো রুটি, ক্ষীর, পাকা ফলের টুকরা ও রস

১-২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য: পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য রান্না-করা ভাত, ডাল, এবং শাক-সব্জি, এক টুকরো মাছ-মাংস-কলিজা একসাথে চটকিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে

আইসিডিডিআর,বি-র পুষ্টি গবেষণা কর্মসূচির বিজ্ঞানীগণ শিশুদের পরিপূরক খাবার হিসেবে আদর্শ মানের খিচুড়ি, হালুয়া এবং দুধযুক্ত সুজির যথাযথ উপাদান নির্ধারণ করেছেন। এসব খাবার কী দিয়ে এবং কীভাবে রান্না করতে হয় সে-সম্পর্কে কেন্দ্রের পুষ্টি পুনর্বাসন ইউনিটে মা ও শিশুদের সেবাযত্নকারী মহিলাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। আফ্রিকা মহাদেশের যেসব দেশে অপুষ্টি-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বেশি সেসব দেশেও আইসিডিডিআর,বি-আবিষ্কৃত এসব খাদ্যের ফর্মুলা ইতোমধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছে। নিচে এসব খাদ্যের উপাদান ও রন্ধন-প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

খিচুড়ির উপাদান ও রান্না-প্রণালী

চাল (১২০ গ্রাম), মুশুর ডাল (৬০ গ্রাম), সয়াবিন তেল (৭০ মিলিলিটার), আলু (১০০ গ্রাম), মিষ্টি কুমড়া (১০০ গ্রাম), পাতাযুক্ত শাক-শব্জি (৮০ গ্রাম), পেঁয়াজ (৫০ গ্রাম), আদা, রসুন, হলুদ, জিরাজাতীয় মশলা (৫০ গ্রাম) এবং পানি (১ লিটার)।

প্রথমে চাল, ডাল, তেল ও পানি একটি পাত্রে ২০ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর আলু, টুকরা-করে কাটা মিষ্টি কুমড়া ও মশলা পাত্রে ঢেলে নাড়তে হবে। কুচি-কুচি করে কাটা শাক-শব্জি চাল-ডাল সিদ্ধ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পাত্রে ঢেলে দিয়ে সামান্য নাড়তে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাত্রের ঢাকনা খোলা উচিত নয়। সর্বমোট ৫০ মিনিটের মত সময় ধরে জ্বাল দেওয়া বিধিসম্মত। এভাবে রান্না-করা খিচুড়ির মোট পরিমাণ হওয়া চাই ১,০০০ গ্রাম। রান্নার পর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে এই খিচুড়ি শিশুদের খাইয়ে শেষ করতে হবে।

দুধযুক্ত সুজির উপাদান ও রান্না-প্রণালী

পাউডার দুধ (৪০ গ্রাম), চালের গুঁড়া (৪০ গ্রাম), চিনি (২৫ গ্রাম), সয়াবিন তেল (২৫ গ্রাম), ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড (০.৫ গ্রাম), পটাশিয়াম ক্লোরাইড (১ গ্রাম) এবং ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (২ গ্রাম)।

সব উপাদান একত্রে ভালো করে মিশিয়ে একটি সসপ্যান বা পাতিলে ঢেলে তাতে ১ লিটারের সামান্য কম পানি ঢেলে আবারও ভালো করে নাড়তে হবে। এক মিনিট জ্বাল দেওয়ার সবটা সময় চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। ঠাণ্ডা করার পর যদি দেখা যায় খাবারের সর্বমোট পরিমাণ ১ লিটারের বেশি হয়েছে তবে আবারও জ্বাল দিয়ে পানি উড়িয়ে দিয়ে ১ লিটার বানাতে হবে। যদি এর পরিমাণ ১ লিটারের কম হয় তবে পানি মিশিয়ে ১ লিটার বানাতে হবে এবং প্রয়োজনমত ঠাণ্ডা করে শিশুদের খাওয়াতে হবে।

হালুয়ার উপাদান ও রান্না-প্রণালী

গমের আটা (২০০ গ্রাম), মুশুর ডাল (১০০ গ্রাম), সয়াবিন তেল (১০০ মিলিলিটার), গুড় বা লালচিনি (১২৫ গ্রাম) এবং পানি (৬০০ মিলিলিটার)।

পানির মধ্যে ডাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে চটকিয়ে নিতে হবে। একটি গরম তাওয়ায় নেড়েচেড়ে গমের আটা কয়েক মিনিট ভাজতে হবে। এর পর এই আটার সঙ্গে চটকানো ডাল, তেল ও পানি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। সবশেষে গুড় বা লালচিনি মিশাতে হবে। ঠিক ততক্ষণই জ্বাল দিতে হবে যতক্ষণ হালুয়ার মোট পরিমাণ ১,০০০ গ্রাম না-হয়।

মনে রাখতে হবে সবসময় কেবল খিচুড়ি, হালুয়া বা দুধযুক্ত সুজির একটিমাত্র খাওয়ালেই চলবে না। শিশুদের খাবারে যেন শর্করা, আমিষ, ভিটামিন, খনিজলবণ, স্নেহজাতীয় খাবার ও পানি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বয়স বৃদ্ধির সাথে-সাথে শিশুর খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। এসময় দই, ক্ষীর, কাস্টার্ড, পুডিং, ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে, যা শিশুর জন্য খুবই উপকারী এবং পরিপূরকও বটে ■

ধুমপান বিষপানের সামিল

এই বদঅভ্যাস ত্যাগ করার কিছু কৌশল

এম মতিউর রহমান
প্রাক্তন ফিজিশিয়ান ম্যানেজার, স্টাফ ক্লিনিক, আইসিডিডিআর,বি

ধুমপান একটি মারাত্মক বদঅভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই যেখানে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। এসব জেনেশুনেই অনেকে ধুমপান করেন, আর নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিসহ জীবন যাপন করে অকাল মৃত্যুকে ডেকে আনেন। একজন ধুমপায়ী ধুমপান করার সময় নিজের যতটুকু ক্ষতি করেন, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেন যিনি পাশে বসে থাকেন তার। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তার একটি অধিকার-বহির্ভূত কাজ। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, তাই সজ্ঞানে কেউ আগুনে হাত দেয় না। কিন্তু ধুমপানে এত ক্ষতি জেনেও একজন লোক ধুমপান করেন, কারণ তিনি নেশার মায়াজালে আটকা পড়েছেন।

ভাবতে অবাক লাগে: বিশ্বে এখন প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন লোক ধুমপান বা তামাক ব্যবহারজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করছে। সে-হিসাবে বছরে ৩০ লাখ লোক ধুমপানের কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করে। যদি এই ধারা চলতে থাকে, তবে আজ থেকে ২০ বছর পর প্রায় ১ কোটি লোক প্রতিবছর তামাক ব্যবহারের কারণে মারা যাবে। কী সাংঘাতিক কথা! সুতরাং আর দেরি নয়। নেশার এই ঘোর থেকে মানুষকে ফেরাতেই হবে। মানবজাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে, আর সেজন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রয়োজন এখনই ধুমপান-বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ধুমপান কী কী ক্ষতি করে

বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় কয়েক হাজার রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্যান্সার রোগ সৃষ্টির জন্য সরাসরি দায়ী। তাছাড়া, নিকোটিন ও কার্বন মনোক্সাইড-নামক যে দু'টি ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে, সেগুলো মানুষের শরীরে নানারকম মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে:

ক্যান্সার: ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, গলনালী, জিহ্বা, মুখ-গহ্বর, ঠোঁট, ইত্যাদি অঙ্গের ক্যান্সারের জন্য ধুমপানই প্রধানত দায়ী

হৃদরোগ: ধুমপান হার্ট অ্যাটাকের একটি অন্যতম কারণ

স্ট্রোক: স্ট্রোকের অনেক কারণের মধ্যে ধুমপান একটি প্রধান কারণ। ধুমপানের ফলে মস্তিষ্কের রক্তনালী ও রক্তপ্রবাহে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে স্ট্রোক হয়ে থাকে

উচ্চ রক্তচাপ: ধুমপানের ফলে শরীরে গৃহীত নিকোটিন হৃৎকম্পন (হার্টবিট) স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং অনেকের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে।

ফুসফুসের অন্যান্য রোগ: ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসিমা, কর-পালমোনালী, ইত্যাদি মারাত্মক রোগ ধুমপানের ফলে হতে পারে।

রক্তনালীর বিশেষ রোগ: বিড়ি-সিগারেটের নিকোটিনের ফলে রক্তনালীর মাংসের সংকোচন হয় এবং রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফলে 'বার্জাস ডিজিজ' নামক মারাত্মক রোগ হতে পারে। এ-রোগে অনেক সময় পা বা হাত কেটে ফেলে দিতে হয়।

বুদ্ধি এবং অনুভূতির ওপর ধুমপানের প্রভাব: ধুমপানের মাধ্যমে শরীরে গৃহীত কার্বন মনোক্সাইড শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচলে এবং অক্সিজেন সরবরাহে যে বিঘ্ন ঘটায় তার ফলে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে অসুবিধাসহ বুদ্ধিমত্তা এবং বিচার-বিবেচনায়ও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভবতী মা ধুমপান করলে অকালে গর্ভপাত, গর্ভস্থিত শিশুর মৃত্যু এবং শিশুর জন্ম-ওজন কম হতে পারে।

ধুমপায়ীর পাশে-থাকা মানুষের ওপর প্রভাব

তাৎক্ষণিক প্রভাব: নাক ও চোখ জ্বালা-করা এবং পানি-পড়া; মাথা ভারভার-লাগা বা মাথা-ধরা।

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব: ধুমপায়ীর মতই হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ইত্যাদি হতে পারে। অধিকন্তু ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যাজমার রোগীদের রোগের মাত্রা বেড়ে মারাত্মক পর্যায়ে যেতে পারে।

শিশুদের ওপর ধুমপানের প্রভাব

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। সুতরাং বড় কাউকে ধুমপান করতে দেখলে সে-ও ধুমপানে অভ্যস্ত হতে পারে এবং এর পরিণতিতে স্কুল ফাঁকি-দেওয়া, মিথ্যা-বলা, লেখাপড়ায় অমনোযোগী-হওয়া, এমনকি মাদকাসক্তও হয়ে যেতে পারে।

ধুমপায়ীদের কাছে-থাকা শিশুদের কান-পাকা রোগ, শ্বাসনালীর নানাবিধ রোগসহ বুদ্ধিমত্তার বিকাশে ভাটা পড়তে পারে।

দুর্ঘটনা

জলন্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত বিড়ি-সিগারেট থেকে মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

ধুমপান ছেড়ে দিলে কী কী উপকার পাওয়া যায়:

- সুস্থ, প্রাণবন্ত ও দীর্ঘ জীবন
- মুখের দুর্গন্ধ ও অর্থের অপচয় থেকে মুক্তি
- সুস্থ মাড়ি ও পরিচ্ছন্ন দাঁত
- ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ইত্যাদি মারাত্মক রোগের আশংকা অনেক কমে-যাওয়া
- সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠার সময় শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি

- বিড়ি-সিগারেট কেনার টাকা বেঁচে যাওয়ায় তা সংসারের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি
- প্রাত্যহিক কাজের জন্য সময়ের অপচয় রোধ
- ধুমপানজনিত অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা-পাওয়া

কীকরে ধুমপান ছাড়বেন

প্রায়শ বলা হয়: ধুমপান ছাড়ার জন্য আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজটা অত সহজ নয়। তবে ধুমপান ত্যাগের ব্যাপারে দৃঢ় মনোবল এবং প্রতিজ্ঞা অবশ্যই দরকার। ইচ্ছা করলে আপনি ধূমপান একদিনেই ছেড়ে দিতে পারেন অথবা আস্তে-আস্তেও ছাড়তে পারেন। যেভাবেই ছাড়তে চান, আপনাকে একটা নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ঠিক করে নিতে হবে। আর সেটি যেন ২-৩ সপ্তাহের বেশি না-হয়। ধুমপান ত্যাগের প্রক্রিয়া হিসেবে নিচে কিছু উপায় বাতলে দেওয়া হলো:

- আপনি যদি প্রত্যহ ১৫টা বিড়ি-সিগারেট খান তবে সিদ্ধান্ত নিন রোজ একটা কম খাবেন
- কখনো একসঙ্গে এক প্যাকেট বিড়ি-সিগারেট কিনবেন না; একটি-একটি করে কিনবেন
- বিড়ি-সিগারেট ধরালে কয়েক টান দিয়ে যথাস্থানে ফেলে দিবেন
- নতুন বিড়ি-সিগারেট ধরাবার আগে হিসাব করে দেখুন আপনার প্রতিজ্ঞামাফিক আজ আর তা খাবার কথা কি না
- আপনার সঙ্গে আপনার কোনো বন্ধুকেও বিড়ি-সিগারেট ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করুন
- আপনি কারো সঙ্গে বিড়ি-সিগারেট ছাড়ার ব্যাপারে বাজি ধরুন
- বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার কথা মনে হলে বিড়ি-সিগারেট না-ধরিয়ে মুখে একটু ভাজা ধনে কিংবা মহুরী নিয়ে চিবাতে থাকুন
- প্রতিদিন একটি-একটি করে বিড়ি-সিগারেট কম খেতে-খেতে আপনার নির্ধারিত ধূমপান ত্যাগের দিন আসলে আর একটিও খাবেন না
- ধুমপান ত্যাগের দিন বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেট, ছাইদানী, দিয়াশলাই, লাইটার—এসব ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিন

এরপর ধুমপানের ইচ্ছা হলেই এর ক্ষতিকর দিকগুলোর কথাগুলো মনে করুন এবং যেসব জায়গায় ধুমপান হয় না এমন জায়গায় কিছুটা সময় কাটান [যেমন লাইব্রেরি, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, হাসপাতাল বা অন্য কোনো ধুমপানমুক্ত এলাকা]। ধুমপায়ীদের এড়িয়ে চলুন। এরপরও যদি পূনরায় আপনি ধুমপান শুরু করেন, তবে হতাশ হবেন না। পূনরায় আগের মতই দিন-তারিখ ঠিক করে নতুন সংগ্রামে নামুন। জয় আপনার একদিন হবেই ■

শিশুর জন্য মায়ের দুধ: সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি

অর্জুন চন্দ্র দে
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালি, ঢাকা
লক্ষী সাহা
সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফেনী
হরিবন্ধু শর্ম্মা
আইসিডিডিআর,বি

শিশু জন্মের পর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের দুধ পান করবে—সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে: বর্তমান আধুনিক যুগেও মায়ের দুধ বিষয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বিদ্যমান। অথচ আমাদের মত দরিদ্র দেশে সঠিক নিয়মে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো সম্ভব হলে লক্ষ লক্ষ শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতো এবং অসংখ্য শিশু অপুষ্টিসহ অন্যান্য মারাত্মক অসুস্থতা থেকে রক্ষা পেতো।

আমাদের দেশে মায়েরা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে যেসব সাধারণ ভুলগুলো করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি আমরা নিচে উল্লেখ করছি এবং প্রকৃতপক্ষে কী করণীয় সে-সম্পর্কেও আলোকপাত করছি:

- বুকের দুধ খাওয়ানো কখন শুরু করবেন এ-বিষয়ে মায়েদের মধ্যে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এ-বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশেষ করে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করলে সমস্যাটি আরো তীব্র হয়। সন্তান প্রসব যে-প্রদ্ধতিতেই হোক না কেন, শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে জন্মের পরপরই। সময়ের হিসেবে অবশ্যই শিশুর বয়স এক ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই। মনে রাখতে হবে: বুকের দুধ দিতে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব শিশুর জন্য অনেক জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
- মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করার আগে সাধারণত দেখা যায় (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) শিশুকে মধু, মিশ্রি, চিনির পানি, গুকোজের শরবত, সাধারণ পানি, ইত্যাদি দেওয়া হয়। এটি শিশুর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই একটিমাত্র কারণে নবজাতকের শরীরে নানা ধরনের সংক্রমণ, অত্যধিক বমি, খাবারে অনীহা, ইত্যাদি জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ-ক্ষেত্রে করণীয় হলো: জন্মের পর শিশুকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছুই খাওয়ানো যাবে না।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর জন্মের পর মায়ের বুক থেকে অত্যন্ত গাঢ় ও পুষ্টিকর যে শালদুধ নিঃসৃত হয়, সেটি গলিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ শালদুধের পুষ্টিগুণ ও জীবাণুরোধক গুণাগুণ সাধারণ দুধের চেয়ে অনেক বেশি এবং এটি নবজাতকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি খাবার, এমনকি প্রতিষেধক হিসেবেও কাজ করে। এছাড়াও, শালদুধ নিঃশেষ হলে সাধারণ দুধের নিঃসরণ স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত হয়।
- বুকের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিঃসৃত হতে প্রাকৃতিক নিয়মেই ৩-৪ দিন সময় লাগে। এসময় পর্যন্ত যতটুকু বুকের দুধ পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে শিশুর জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। অনেক সময় অধৈর্য হয়ে অনেকেই শিশুকে গুঁড়াদুধ খাওয়ানো শুরু করে দেন, যা অত্যন্ত মারাত্মক একটি ভূল। কোনোমতেই এ-কাজ করতে নেই। এতে শিশুর নানা ধরনের অসুস্থতার পাশাপাশি মায়ের দুধের স্বাভাবিক নিঃসরণ বিলম্বিত হতে পারে।

শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত তাকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনোকিছু খাওয়ানো যাবে না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুয়ায়ী কেবল অষুধ খাওয়ানো যাবে। শিশুর সুস্বাস্থ্য ও মেধার বিকাশের জন্য এই অভ্যাসটি গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়: কিছুদিন বুকের দুধ খাওয়ানোর পর মনে হয় দুধ কমে গেছে। এমন ধারণা থেকে অনেকে শিশুকে গুঁড়াদুধ, সুজি ও বার্লিসহ অন্যান্য খাবার দেওয়া শুরু করে দেন, যা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো মা যদি সত্যিসত্যি তার বুকে দুধের স্বল্পতা আছে বলে মনে করেন, তবে তিনি নিজের খাওয়া বাড়িয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন।

আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য দুগ্ধপোষ্য যেসব শিশু ভর্তি হয় সঠিক নিয়মে বুকের দুধ খাওয়ানো বিষয়ে তাদের মায়েদেরকে পরামর্শ দান করা হয়

শিশুর বয়স ২ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত সে বুকের দুধ পান করতে পারে। তবে তার বয়স ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার, যেমন নরম ভাত, পাকা কলা, আলু ভর্তা, ফলের রস, এবং এরপর খিচুড়িসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার নরম করে খেতে দিতে হবে। এ-ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ৬ মাস পরে অনেকেই বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুকে প্যাকেটজাত শর্করা, গুঁড়াদুধ, সাগু, সুজি, বার্লি, গরুর দুধ, ইত্যাদি খাবার দিচ্ছেন। এগুলো শিশুর উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে থাকে। তবে, শিশুর বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর গরুর দুধ খাওয়ানো যায় ■

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি তথ্য

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে গর্ভাবস্থা থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন
- জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করুন
- শালদুধ গলিয়ে ফেলে দিবেন না। প্রথমেই শালদুধ শিশুকে খেতে দিন
- কোনো অবস্থাতেই মধু, মিশ্রি, চিনির শরবত, ইত্যাদি শিশুকে খাওয়াবেন না
- শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত তাকে কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান
- দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ খেতে পারে
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে তাকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য নরম খাবার দিন

সঠিক খাদ্যগ্রহণ শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল

কুন্তল কুমার সাহা
মোঃ তৌফিকুর রহমান
আইসিডিডিআর,বি

শিশুর জন্মের পর থেকে প্রথম এক বছরে শিশুর যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অর্জনের জন্য সঠিক খাদ্যগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের খাদ্যগ্রহণ নিয়ে অনেক গবেষণায় দেখা গেছে: অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণ শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং শিশুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে এবং শিশুর ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবারও দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার অনেক কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ যৌথভাবে বিশ্বব্যাপী শিশুদের খাদ্যগ্রহণের কৌশল এবং পরিপূরক খাবারের জন্য নীতিমালা তৈরি করেছে যেখানে শিশুস্বাস্থ্যের ওপর শিশুদের সঠিক খাদ্যগ্রহণের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও এই খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে, তবুও খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা অনুসরণ করলে তা শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে কেমন ভূমিকা রাখে তার ওপর কোনো গবেষণা ইতোপূর্বে পরিচালিত হয় নি।

এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় "শিশুদের সঠিক খাদ্যগ্রহণের ফলে জন্মের প্রথম বছরে এবং শৈশবকালে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি কেমন হয়" শীর্ষক এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত আইসিডিডিআর,বি-পরিচালিত "ম্যাটারন্যাল অ্যান্ড ইনফ্যান্ট নিউট্রিশন ইন মতলব (MINIMat)-শীর্ষক গবেষণা কর্মসূচি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদের জন্মের পর প্রথম ২ বছর বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলো। মোট ১,৩৪৩ জন শিশুর ওপর গবেষণা চালানো হয় যাদের জন্ম ২০০২ সালের মে মাস থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৪ মাস সময়ব্যাপী এসব শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলো । মায়ের কাছ থেকে শিশুর খাদ্যগ্রহণের তথ্য নেওয়া হয়েছে প্রথম এক বছর পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার করে এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও অসুস্থতার তথ্য নেওয়া হয়েছে জন্মের প্রথম এক বছরে প্রতিমাসে একবার করে এবং দ্বিতীয় বছর থেকে ৩ মাস পর পর তথ্য নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্ত বিশেষণ করে দেখা যায়: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদের গড় জন্ম-ওজন ছিলো কমবেশি ২,৬৯৭ গ্রাম; শতকরা ৩০ ভাগ শিশুর জন্ম-ওজন ছিলো ২,৫০০ গ্রামের কম। ১২ মাস ও ২৪ মাস বয়সের শিশুদের গড় ওজন ছিলো যথাক্রমে কমবেশি ৭.৯ কেজি এবং ৯.৭

শিশুদের পরিপূরক খাবার বিষয়ে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে আগত শিশু-রোগীদের মা ও তাদের সেবাযত্নকারী মহিলাদের নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হয়

কেজি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত নতুন মান অনুযায়ী ৬ মাস, ১২ মাস এবং ২৪ মাস বয়সের শিশুদের গড় ওজনের ঘাটতি যথাক্রমে ০.৯১ কেজি, ১.৩৭ কেজি এবং ২.১০ কেজি।

সঠিক খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা অনুসরণ না-করার কারণে আমাদের শিশুরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত আদর্শ ওজন অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে।

জন্মের পর শিশুকে দেওয়া খাবারের ধরন

শাল-দুধসহ মায়ের দুধ দেওয়ার আগে যেসব খাবার জন্মের পর শিশুকে প্রথম দেওয়া হয় সে-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে দেখা যায়: শিশুর জন্মের পর শতকরা ৯২ ভাগ মা শিশুকে শাল-দুধ দিয়েছিলেন এবং শতকরা মাত্র ৮ ভাগ মা তাদের শিশুদের অন্যান্য তরল খাবার দিয়েছিলেন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল শিশু (শতকরা ৯৯.৪ ভাগ) তাদের এক মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছিলো এবং এদের মধ্যে শতকরা ৯২ ভাগ শিশু ১২ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছিলো। শিশুদের বয়স যখন ১ মাস তখন কেবলমাত্র বুকের দুধ-খাওয়া শিশুদের শতকরা হার কমে গিয়ে ৭৮.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছিলো এবং শিশুদের ৬ মাস বয়সে এই হার ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে শতকরা ১০.৭ ভাগে নেমে এসেছিলো। কিন্তু প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী সকল শিশুর জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত। শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়েছিলো এমন শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানোর গড় সময়কাল ৪ মাস। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী তা হওয়া উচিত ছিলো ১৮০ দিন। এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে: প্রচলিত খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা থেকে তাদেরকে প্রায় ২ মাস কম সময় মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়েছে। এই তথ্য থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত শিশুদের খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় নি।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতকরা ৩.৭ ভাগ শিশু জন্মের পরপরই খাবার পানি খেয়েছিলো এবং শিশুদের বয়স যখন ১ মাস তখন পানি খাওয়ানোর এই হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭৬ ভাগে দাঁড়ায় এবং শিশুদের ৬ মাস বয়সে এই হার ছিলো শতকরা ৯৭.২ ভাগ।

শিশুর জন্মের পর প্রথম ৫ মাস বয়সের মধ্যে শিশুদের ফলের রস খাওয়ানোর প্রবণতা কম থাকে কিন্তু শিশুর ৬ মাস বয়সে এই হার শতকরা ৩৭.৩ ভাগে উন্নীত হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে: খুব কমসংখ্যক শিশুকেই জন্মের প্রথম মাসে গরুর দুধ খাওয়ানো হয়েছিলো, কিন্তু শিশুদের ৬ মাস বয়সে এই হার শতকরা ৪১ ভাগে উন্নীত হয়।

১ মাস বয়সে শতকরা ২.২ ভাগ শিশুকে অর্ধ-তরল খাবার দেওয়া হয়েছে এবং এই হার শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে-সাথে বাড়তে থাকে এবং ৬ মাস বয়সে প্রায় অর্ধেক (শতকরা ৪৯.৬ ভাগ) শিশুকে অর্ধ-তরল খাবার দেওয়া হয়েছে।

শিশুর জন্মের পর প্রথম ৫ মাস বয়সের মধ্যে খুব কমসংখ্যক (শতকরা ১৩.২ ভাগ) শিশুকে শক্ত খাবার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই হার দ্রুত বেড়ে ৬ মাস বয়সে শতকরা ৪৩.৯ ভাগ এবং ১০ মাস বয়সে শতকরা ৯৪.১ ভাগে উন্নীত হয়।

> **খাদ্যগ্রহণের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী শিশুর জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত এবং এসময়ে খাবার পানি বা অন্য কোনো খাবার দেওয়া উচিত নয়**

১ মাস বয়সেই শতকরা ২.৪ ভাগ শিশুকে পরিপূরক খাবার দেওয়া হয় এবং ৬ মাস বয়সে দুই-তৃতীয়াংশ (শতকরা ৬৬.৭ ভাগ) এবং ৯ মাস বয়সে শতকরা ৯৫ ভাগ শিশুকে পরিপূরক খাবার দেওয়া হয়েছে।

শিশুদের খাদ্যগ্রহণের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে তাকে অবশ্যই পরিপূরক খাবার দিতে হবে এবং সঠিক সময়ে পরিপূরক খাবার দেওয়া না-হলে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

শিশুকে পরিপূরক খাবার দেওয়ার নিয়ম নিচের ছকে দেখানো হলো:

৬ মাস বয়স থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত	১২ মাস বয়স থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত
শিশু যতবার মায়ের দুধ খেতে চায় ততবারই খাওয়াতে হবে	শিশু যতবার মায়ের দুধ খেতে চায় ততবারই খাওয়াতে হবে
মায়ের দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে পর্যাপ্ত ডাল, ভাত, হালুয়া, খিচুড়ি, ডিম, মাছ, সবুজ শাক-সব্জি, হলুদ ফল, যেমন পাকা পেঁপে, কলা, কাঁঠাল, ইত্যাদি খাওয়াতে হবে	মায়ের দুধ খাওয়ানোর আগে শিশুকে পর্যাপ্ত ডাল, ভাত, হালুয়া, খিচুড়ি, ডিম, মাছ, সবুজ শাক-সব্জি, হলুদ ফল, পাকা পেঁপে, কলা, কাঁঠাল বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যে খাবার খায় তা দেওয়া যেতে পারে
দিনে ৩ বার এসব খাবার দিতে হবে যদি শিশু মায়ের দুধ খায়	দিনে ৫ বার এসব খাবার দিতে হবে যদি শিশু মায়ের দুধ না-খায়
দিনে ৫ বার এসব খাবার দিতে হবে যদি শিশু মায়ের দুধ না-খায়	

তথ্যসূত্র: আইএমআইসিআই নীতিমালা ২০০১

উল্লিখিত গবেষণায় দেখা যায়: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-প্রবর্তিত শিশুদের খাদ্যগ্রহণের প্রচলিত নীতিমালা সকল শিশুর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় নি। এর কারণ সম্ভবত এ-বিষয়ে সঠিক তথ্য বাংলাদেশের মায়েদের কাছে পৌঁছায় নি। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে: গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত শিশুদের মধ্যে যাদের ক্ষেত্রে খাদ্যগ্রহণের প্রচলিত নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার হার অন্যদের চেয়ে বেশ ভালো। অতএব, এই গবেষণার ফলাফল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জোরালোভাবে এই সত্য সমর্থন করে যে, শিশুদের খাদ্যগ্রহণের প্রচলিত নীতিমালা শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই গ্রামাঞ্চলের এই জনগোষ্ঠিতে শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে তাদের জন্য নির্ধারিত খাদ্যগ্রহণের নীতিমালা-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে শিশুকে কতবার খাওয়াতে হবে, শিশুদের খাদ্য কী কী উপাদানে সমৃদ্ধ হতে হবে, পুষ্টির ঘনত্ব কীরকম হবে, কীকরে খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে শিশুকে উৎসাহিত করা যাবে—এসব তথ্য যথাযথভাবে মায়েদের কাছে পৌঁছাতে হবে। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠির শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুখাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের খাদ্যগ্রহণের গুণগত ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন বাংলাদেশে তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণের অন্যতম উপায় হতে পারে ■

[এ-লেখায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত কেকে সাহা, ইএ ফ্রনজিলো, এসএ দেওয়ান, এসই আরিফিন, এলএ লার্সন এবং কেএম রাসমুসেন-রচিত "অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাক্টিসেস রিজাল্ট ইন বেটার গ্রোউথ অব ইনফ্যান্টস অ্যান্ড ইয়ং চিলড্রেন ইন রুরাল বাংলাদেশ" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত, যা আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, ভলিয়ুম ৮৭-এর ১৮৫২-৯ পৃষ্ঠায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে]

সংলাপ রিপোর্ট

ঢাকার মিরপুরে আইসিডিডিআর,বি-র চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে

এ-বছর বন্যা আসার আগেই যখন মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মহাখালিতে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে ডায়রিয়া রোগীর চাপ বাড়তে থাকে তখন বরাবরের মত তাঁবু খাটিয়ে বাড়তি রোগীর স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হয়। রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে হাসপাতালের করিডোর, এমনকি গাড়ি-রাখার গ্যারেজে নির্মিত তাঁবুতেও যখন তিল ধারণের ঠাঁই ছিলো না তখন বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুরোধে আইসিডিডিআর,বি ঢাকার মিরপুরে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে, যা আরো দীর্ঘদিন ডায়রিয়া রোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মিরপুরস্থ সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে স্থাপিত ৫০-বেডের এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি গত ৩০ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে।

মিরপুরস্থ সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে স্থাপিত কর্মমুখর আইসিডিডিআর,বি-র ডায়রিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র

মহাখালির ঢাকা হাসপাতালে আসার আগেই মারাত্মক পানিশূন্যতার কারণে যেসব রোগীর মৃত্যু হতে পারতো, মিরপুরে এই চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য তারা স্থানীয়ভাবেই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার মাধ্যমে জীবন রক্ষার সুযোগ পেয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করে এবং মাইকিং করে এই নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য তাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে ■

আইলা-কবলিত এলাকায় আইসিডিডিআর,বি-র বিশেষজ্ঞ দল প্রেরণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রতি আইলা-নামক যে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হেনেছিলো, তাতে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেওয়ায় ডায়রিয়া রোগের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আইলা-কবলিত এলাকায়, বিশেষত সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায়, এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আইসিডিডিআর,বি সম্প্রতি একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছিলো। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং আক্রান্ত লোকদের সরাসরি চিকিৎসা-সেবা প্রদানের জন্য প্রেরিত এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন মহাখালিস্থ ঢাকা হাসপাতালের শর্ট স্টে ওয়ার্ড-এর প্রধান ডাঃ আজহারুল ইসলাম খান। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন: ডাঃ এসকে রায়, এএসজি ফারুক, সিরাজউদ্দিন আহমেদ, জাহিদ হায়াৎ মাহমুদ, মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ হারিসুর রহমান, মমতাজ বেগম, মতিলাল বৈদ্য এবং আয়নাল হক। সিনিয়র চিকিৎসক, মহামারী নিয়ন্ত্রণ-বিশেষজ্ঞ, জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সদের সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি ১,০০০ লিটার শিরার স্যালাইন, ২,০০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকসহ নানা অষুধপত্র, ত্বকের মলম ও পানি বিশুদ্ধিকরণের উপকরণ নিয়ে গিয়েছিলো। জুন মাসের ২ তারিখ থেকে দুর্গত স্থানসমূহে চিকিৎসা-সেবা প্রদান শেষে দলটি ৭ তারিখে ফিরে আসে ■

আইলা-কবলিত এলাকায় পাঠানো আইসিডিডিআর,বি-র চিকিৎসক ও মহামারী বিশেষজ্ঞ দল